উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা অবলম্বনে

ছোটোদের রামায়ণ

সংগ্রহ ও সরলীকরণ

রহীম শাহ

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

উ ৎ স র্গ

ইরিত্রা দেব

রামায়ণকথা

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ কাহিনি রচনা করেন। রামায়ণে প্রথমে ছয়টি কাণ্ডে চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল। পরবর্তীতে বাল্মীকি উত্তর-কাণ্ড রচনা করার কারণে রামায়ণে কাণ্ড সংখ্যা হয় সাতটি, যথা–আদি-কাণ্ড, অযোধ্যা-কাণ্ড, অরণ্য-কাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড, সুন্দর-কাণ্ড ও লঙ্কা-কাণ্ড। রামায়ণে রামের প্রিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম এবং সত্যপরায়ণতা আজও সকলের শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয়। দেবী সীতা তাঁর সতীত্ব ও পতিভক্তির জন্য সকল হিন্দুনারীর নিকট আদর্শনীয়া ও পাতঃস্মরণীয়া হয়ে আছেন। দর্শন বিচারে রাম শুভ বিবেক আর রাবণ ভোগের প্রতীক। রাবণের দশ মাথা দশ ইন্দ্রিয়কে সূচিত করে। ঐ দশ ইন্দ্রিয় শুধু বিষয়-ভোগে নিয়োজিত থাকে। বিষয়-ভোগে উন্মত্ত ইন্দ্রিয় রূপ রাবণ যখন আনন্দময়ী শক্তি রূপ সীতাকে হরণ করে তখন বিবেক রূপ রাম রাবণকে বধ করে আনন্দময়ী সীতাকে উদ্ধার করেন। সুতরাং জ্ঞান বা বিবেকের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে দমন করলে দেহে আনন্দময়ী সত্তা জাগ্রত হয়–এটাই রামায়ণের মূল-বস্তু। রামায়ণে রাম ১৫ বছর বয়সে মিথিলার রাজা জনকের কন্যা সীতা দেবীকে বিবাহ করেন। ১২ বছর অযোধ্যায় বসবাসের পর ২৭ বৎসর বয়সের সময় রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য অষ্টাদশবর্ষীয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে ১৪ বৎসরের জন্য বনবাসে যান। বনবাসের ১৩ বছর শেষে মাঘ মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে রাবণ সীতাকে হরণ করে। পরের বছর মাঘ মাসের দ্বিতীয়াতে রাম ও রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৮৭ দিন পর কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে রাবণকে বধ করে রাম সীতা দেবীকে উদ্ধার করেন।

অনেক দিন আগে খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'ছেলেদের রামায়ণ' নাম দিয়ে একটি ক্ষুদ্র শিশুপাঠ্য বই লেখেন। বাংলায় রামায়ণবিষয়ক যত বই পেয়েছি, সবগুলোই ছিল সাধু ভাষায়। তাই নতুন করে লেখা হলো বইটি। এই সময়ের শিশুরা যাতে আনন্দ নিয়ে বইটি পড়তে পারে, তার জন্য পুরো বইটিকে সহজ ও সরলীকরণ করা হয়েছে।

কাহিনিকে অপরিবর্তিত রেখে সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা হয়েছে চলতি ভাষায়। এ বইতে ছবি এঁকেছেন বাংলাদেশের শিল্পী মুকুল রেজা। বাংলাদেশের কিশোর পাঠকরা ছোটোদের রামায়ণ পড়ে আনন্দলাভ করলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক বলে মনে করব।

ঢাকা

রহীম শাহ

সূচি

আদিকাণ্ড	১১
অযোধ্যাকাণ্ড	২৪
অরণ্যকাণ্ড	৪৯
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	৬৪
সুন্দরকাণ্ড	৭৯
লঙ্কাকাণ্ড	৯৬

আদিকাণ্ড

অনেক দিন আগে আমাদের এই ভারতবর্ষে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। সরযু নদীর ধারে, অযোধ্যা নগরের রাজা তিনি।

সেকালের অযোধ্যা নগর আটচল্লিশ ক্রোশ লম্বা, আর বারো ক্রোশ চওড়া ছিল। তার চারদিকে প্রকাণ্ড দেয়ালের ওপরে লোহার কাঁটা দেওয়া ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র সাজানো থাকত। সে অস্ত্রের নাম শতঘ্নী। কেননা, তা ছুড়ে মারলে শত লোক মারা পড়ে।

তখনকার অযোধ্যা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ছায়ায় ঢাকা পরিষ্কার পথ, ফুলে ভরা সুন্দর বাগান, আর দামি পাথরের সাততলা আটতলা জমকালো বাড়িতে নগরটি ঝলমল করত।

এই সুন্দর অযোধ্যা নগরে সাদা পাথরের বিশাল রাজপুরীতে সাদা ছাতার নিচে বসে মহারাজ দশরথ তাঁর রাজ্যের কাজ দেখতেন। দৃষ্টি, বিজয়, অকোপ, জয়ন্ত, সুমন্ত্র, সুরাষ্ট্র, ধর্মপাল আর রাষ্ট্রবর্ধন নামে তাঁর আটজন মন্ত্রী এমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর ধার্মিক ছিলেন যে, তাঁরা দেশে একটিও অন্যায় কাজ হতে দিতেন না। সে দেশে চোর-ডাকাত ছিল না। ভালো ছাড়া মন্দ কাজ কেউ করত না। ভালো খেয়ে, ভালো পরে, ভালো বাড়িতে থেকে সবারই সুখে দিন কাটত। রাজা দশরথ তাদের এত স্নেহ করতেন যে, আর কোনো রাজা তেমন করতে পারতেন না। দশরথকেও তারা তেমনি করে ভালোবাসত।

হায়! এমন রাজা দশরথ, তাঁর একটিও ছেলে ছিল না। ছেলে নাই বলে তিনি ভারি দুঃখ করতেন। একদিন তিনি মন্ত্রীদের বললেন, 'দেখ, আমি যজ্ঞ করব। হয়তো তাতে খুশি হয়ে দেবতারা আমাকে পুত্র দেবেন।'

একথা শুনে সবাই বলল, 'মহারাজ, আপনি ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে নিয়ে আসুন। তিনি যজ্ঞ করলে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র হবে।'

এই মুনির হরিণের মতো শিং ছিল, তাই লোকে তাঁকে ঋষ্যশৃঙ্গ বলত। এমন ভালো মুনি কমই দেখা গেছে।

মন্ত্রীদের কথা শুনে দশরথ বললেন, 'বড়ো ভালো কথা। ঋষ্যশৃঙ্গ যে আমার জামাই হন। কারণ, তিনি আমার বন্ধু লোমপাদ রাজার মেয়ে শান্তাকে বিয়ে করেছেন। আমি নিজেই তাঁকে আনতে যাব।'

লোমপাদ রাজার বাড়ি অঙ্গদেশে। দশরথ সেই অঙ্গদেশে গিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে নিয়ে এলেন। তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হলো।

আগে হলো অশ্বমেধ যজ্ঞ। ঘোড়ার মাংস দিয়ে এই যজ্ঞ করতে হয়। প্রথমে একটা ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হলো। ঘোড়ার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অনেক লোকজনও চলল, যাতে কেউ তাকে আটকাতে না পারে। তারা ক্রমে এক বছর ঘোড়াটাকে নানা দেশ ঘুরিয়ে শেষে তাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

তত দিনে শত শত কারিগর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, মজুর মিলে সরযুর উত্তর ধারে যজ্ঞের জন্য চমৎকার জায়গা তৈরি করেছে। সেখানে কত মুনি, কত ব্রাহ্মণ, কত রাজা আর অন্য লোকজন কত এসেছে, তার লেখাজোখা

নেই। মিথিলার রাজা জনক, অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ, মগধের রাজা, পূর্বদেশের রাজা, সিন্ধুদেশের রাজা, সৌবীরের রাজা, সৌরাষ্ট্রের রাজা আর কত বলব! পৃথিবীর যত রাজার সঙ্গে দশরথের বন্ধুতা ছিল, সবাই উপস্থিত।

ঘোড়া ফিরে এলেই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হলো। যজ্ঞের কয়দিন সবাই কী আনন্দ করে যে নিমন্ত্রণ খেল, তা কী বলব! যত চেয়েছে, ততই খেতে পেয়েছে। ব্রাহ্মণেরা ভোজনে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'মহারাজের জয় হোক!' ছেলেদের পেট ভরে গেল, তবুও তারা বলল, 'আরও খাব।'

অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, 'এরপর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে মহারাজের ছেলে হবে।'

তখনই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হলো। সেই যজ্ঞের আগুনের ভেতর থেকে একজন পুরুষ বের হয়ে এলেন। তিনি দেখতে অতি ভয়ঙ্কর। তাঁর শরীর পাহাড়ের মতো উঁচু, রং কালো, চোখ লাল, দাড়ি গোঁফ সিংহের কেশরের মতো, পরণে লাল কাপড়। তাঁর হাতে রুপার ঢাকনা দেওয়া সোনার থালা, তাতে চমৎকার পায়েস। সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ দশরথকে বললেন, 'মহারাজ, ব্রহ্মা নিজে এই পায়েস রেঁধে পাঠিয়েছেন। এটা রানিদের খেতে দাও, নিশ্চয় তোমার পুত্র হবে।' এই বলে তিনি কোথায় যে মিলিয়ে গেলেন, কেউ দেখতে পেল না।

দশরথের কী আনন্দ! এই পায়েস রানিদের খেতে দিলেই তাঁর পুত্র হবে! প্রধান রানি তিনজন–বড়ো কৌশল্যা, মেজো কৈকেয়ী, ছোটো সুমিত্রা। দশরথ কী করে তিনজনকে পায়েস ভাগ করে দিলেন, বলছি। প্রথমেই সেই পায়েসের অর্ধেকটা নিয়ে একটু সুমিত্রার জন্য আর বাকি কৌশল্যার জন্য রাখলেন, তারপর অন্য অর্ধেকেরও একটুটা সুমিত্রার জন্য, আর বাকিটা কৈকেয়ীর জন্য রাখা হলো। বেশ সহজ হিসাব।

তিন রানিতে মিলে মনের সুখে এই পায়েস খেলেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁদের দেবতার মতো চারটি ছেলে হলো–কৌশল্যার একটি, কৈকেয়ীর একটি, আর সুমিত্রার দুটি।

দশরথের পুত্র হয়েছে শুনে যে সবাই আনন্দিত হলো, তাতে আর সন্দেহ নেই? ব্রাহ্মণ আর গরিব-দুঃখীদের তো খুবই আনন্দ হবার কথা, কারণ তারা অনেক টাকা-কড়ি পেল।

ছেলে চারটি এগারো দিনের হলে পুরোহিত বশিষ্ঠমুনি তাঁদের নাম রাখলেন। সবার বড়ো ছেলেটি কৌশল্যার, তাঁর নাম হলো রাম। তার